পাক্ষিক
আলিয়া
আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর একটি উদ্যোগ

আমাদের কথা

পাক্ষিক আলিয়া-র পরিকল্পনা ও পথচলা মুখ্যত আর্থ-সামাজিক, সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে একটু বেশি রকমের পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের আত্মিক বিকাশের লক্ষ্যে। আমরা বিশ্বাস করি, দেশের দুই প্রধান ধর্ম-সম্প্রদায়ের সহাবস্থান ও সুস্থ সামাজিক সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার প্রশ্নে পিছিয়ে পড়া মুসলমান সমাজের সামাজিক জাগরণের কোনো বিকল্প নেই। মুসলমানদের পশ্চাদ্‌বর্তিতা তাদের প্রতিবেশীদের সামাজিক ন্যায়বোধের বিকাশে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করছে বলে আমাদের মনে হয়েছে। আমরা তাই নিজেদের মতো করে পথে নেমেছি। আমাদের এই সিদ্ধান্ত ও ক্রিয়াশীলতা কারও অনুভূতির আঙিনায় বিরূপ ছায়াপাত করলে তার জন্য আমরা দুঃখিত ও ক্ষমাপ্রার্থী। আমরা স্বপ্ন দেখি সেইদিনের, যেদিন হিন্দু-মুসলমান সমাজ পরস্পরের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধাশীল হয়ে উঠবে; শেষ হবে পাক্ষিক আলিয়া-র পথপরিক্রমা। তখন কেবল মাসিক আলিয়া-র ডানায় ভর করে নীল আকাশে পাখা মেলতে পারবো আমরা।

কথার কথা

ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল কাব্যে দেবাদিদেব শিব একটু ভাল খেতে পরতে চেয়ে স্ত্রী পার্বতীর প্রবল মুখ ঝামটা শুনে আক্ষেপ করে বলেছিলেন- 'রসকথা কহিতে বিরস হয়ে যায়।' আমরা দেবাদিদেব নই; ভাল খাওয়া পরা আমাদের আকাঙ্ক্ষা নয়; আমরা সামান্য ডাল ভাত খেয়ে রাতে নিশ্চিন্তে ঘুমাতে পারলেই বর্তে যাই। কিন্তু সেইটুকুতেও যখন অনিশ্চয়তা তৈরি হয় তখন স্বভাবত বিচলিত হই; চিৎকার চেঁচামেচি করি। এদিকে আমাদের এই চেঁচামেচিকে দেশদ্রোহী উচ্চারণ বলে ভুল করা হয়। আমাদের কর্তাব্যক্তিরা তো আর দেবী পার্বতীর মতো সহনশীলা নন। আমাদের ক্ষেত্রে শুধু রসকথা বিরস হয় না, জীবনটাই রসাতলে যায়। আমরা কিছুতেই বোঝাতে পারি না, যে জন্মভূমি ও তার মানুষজনকে সবাই ভালোবাসে। ভালো-মন্দের আলোচনা মানে দ্রোহিতা নয়। গঠনমূলক সমালোচনা আসলে সুস্থ মানবতার স্মারক।

আমাদের কারও ত্রিশ, কারও পঞ্চাশ, কারও সত্তর। জীবনের পথে এতটা দূর হেঁটে আসার পরেও আমরা বুঝতে পারছি না, আমাদের দেশে সরকার ও নাগরিকদের ভূমিকা ঠিক কী! নাগরিকরা দেশের জন্য যথাসাধ্য করবেন, আর দেশের হয়ে সরকার পক্ষ নাগরিকদের জন্য করবেন; এমনটাই এতদিন মনে করতাম আমরা। কিন্তু এখন সে ধারণা-সলিলে ভেলা ভাসানো যাচ্ছে কই! করোনা উত্তর পরিস্থিতিতে পরিযায়ী শ্রমিক সহ অপরাপর বিপন্ন মানুষদের পাশে দাঁড়ানোর প্রশ্নে অধিকাংশ ক্ষেত্রে হাত উল্টে দিলেন সরকার পক্ষ। ক্ষুধার সমুদ্র পেরিয়ে মৃত্যুর শীতল কোলে আশ্রয় নেওয়ার আগে মানুষগুলোর সামনে রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে একটা পোড়া রুটিও মেলে ধরা হলো না। এদিকে তাদেরই ঘরের সন্তানেরা লাদাখ অঞ্চলে বিরুদ্ধ পক্ষের বুলেট বুকে ধারণ করে রক্ত-স্নাত হলো। মরার আগে এ কোন্ সত্যের সাক্ষী হয়ে গেল ওরা! এর পরেই বা ওদের এই আত্মত্যাগের কী মূল্য দিতে পারা যাবে! কে বলতে পারবে, আজ যে শহীদ হলো কাল তার বাবা বা আর কোনো প্রিয়জনকে ঘরে ফেরার জন্য ক্ষুধাতুর দেহে পায়ে হেঁটে শত শত কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে হবে না; অথবা টুকরো টুকরো হতে হবে না ট্রেনের চাকায়।

কোনো নিশ্চয়তা যদি না দেওয়া যাবে তবে ইতিহাসের পাতায় এই আত্মত্যাগের ইতিহাস লেখা হবে কোন্ কালিতে! দু-দিন প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকতে না থাকতে, শ্রমিকদের পারিশ্রমিক দেওয়া বন্ধ করে দেয় শত শত কোটি টাকার অধিকারী যে মালিক পক্ষ, তাদের ব্যবসায়িক চারণভূমিকে উর্বর ও নিশ্চিত নিরাপত্তার চাদরে মুড়ে রাখাতেই কী শেষ হবে এই আত্মত্যাগের ইতিবৃত্ত! বহমান সময় ও ঘটনার গতিমুখ কিন্তু তেমনি কোনো বীভৎস বাস্তবের ইঙ্গিত দিচ্ছে।

করোনা পরিস্থিতি মোকাবিলার ধুয়ো তুলে সরকারি কর্মচারীদের পারিশ্রমিকের অংশ বিশেষ কেটে নেওয়া হয়েছে। এদিকে সরকারি স্তরে কোনোরকম ব্যয় সংকোচনের খবর নেই। দৃষ্টির দর্পণে প্রতিবিম্বিত হয়নি সরকার পক্ষের কর্তাব্যক্তিদের ব্যক্তিগত জীবনাচারের জৌলুশে কোনো ঘাটতি। কেউ কেউ তো রীতিমতো বেপরোয়া। বুভুক্ষু মানুষের আর্তনাদে যখন আলোড়িত হচ্ছে আকাশ বাতাস তখন তাঁরা শত সহস্র কোটি টাকা ব্যয় করে বৈদ্যুতিন যন্ত্র সহযোগে নির্বাচনী প্রচার শুরু করতে কোনোরকম দ্বিধা করছেন না। বোধহয় তাঁরা স্থির প্রত্যয়ে উপনীত হয়েছেন, টাকার ফুলঝুরি ফুটিয়ে রাতকে দিন কিংবা দিনকে রাত করাতে, তাদের দিক থেকে কোনো সমস্যা হবে না। সমস্যা হবে না, প্রয়োজনীয় টাকার সরবরাহ লাইনকে সচল রাখাতেও। কেননা বিপুল রায় বা রাজেশ ওরাংদের সন্ততিরা শেষপর্যন্ত যাবতীয় অপপ্রচারের ঊর্ধ্বে উঠে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের বেদীমূলে তাদের শেষ রক্তবিন্দুকে নিংড়ে দিতে দ্বিধা করবে না। আর এই ভারতীয় জাতীয়তাবাদ রক্ষাকবচ রূপে সুরক্ষিত করবে দেশের প্রধান প্রধান শিল্পপতি ও তাদের পৃষ্ঠপোষকদের ভবিষ্যৎকে। কাজেই কুচ পরোয়া নেহি।

শঙ্কা হচ্ছে; এঁদের এমন বেপরোয়া কামনার অনলে শেষাবধি না জাতিসত্তাকে আত্মাহুতি দিতে হয়।

পাঠক-দর্পণ

পাক্ষিক আলিয়া-র প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা আদ্যন্ত পাঠ করে প্রীত হলাম। অতি তাৎপর্যপূর্ণ বক্তব্য, সংক্ষিপ্ত পরিসরে, অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে; যা মনকে আন্দোলিত করে। সংস্কৃতিচর্চা বিমুখ বাঙালি মুসলমান সমাজের সাপেক্ষে এ এক প্রত্যয়ী পদক্ষেপ। হীনমন্যতার চোরাবালিতে নিমজ্জমান মনকে উজ্জীবিত করার মতো যথেষ্ট রসদ রয়েছে এখানে। পাক্ষিক আলিয়া-র চলার পথ সম্প্রসারিত হলে আমাদের সামাজিক সমীকরণ নতুন মাত্রা পেতে পারে।

আবুল বাসার হালদার, সংগ্রামপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা

ঘোষণা

পাক্ষিক আলিয়া-র চার, আট, বারো ইত্যাদি অর্থাৎ চারের গুণিতক সংখ্যাসমূহ বিশেষ সংখ্যা হিসাবে প্রকাশিত হবে। এক্ষেত্রে চার ও আট সংখ্যার বিষয় থাকছে যথাক্রমে 'দেশভাগ : বাঙালির অপ্রাপ্তি-প্রাপ্তি' এবং 'সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের পরম্পরা ও বাংলা ভাষার পথচলা'। এই প্রেক্ষিতে সুধীজনদের থেকে কমবেশি আটশত শব্দ নির্ভর নিবন্ধ কামনা করা হচ্ছে। অধিক শব্দাশ্রয়ী রচনা মাসিক আলিয়া-র জন্য বিবেচনা করা হতে পারে।

aliahsanskriti@gmail.com, ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯ (হোয়াটস্‌অ্যাপ)

নিবেদন

পাক্ষিক আলিয়া ইংরেজি মাসের দ্বিতীয় ও চতুর্থ রবিবার প্রকাশিত হবে ইনশাআল্লাহ। সুধীজনদের থেকে লেখা প্রদান, প্রচার সহ সম্ভাব্য সব রকমের সহযোগিতা কামনা করা হচ্ছে। লেখা দেওয়ার জন্য ব্যবহার করুন কোনো একটি মাধ্যম : সাইফুল্লা, বাংলা বিভাগ, আলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, ১৭ গোরাচাঁদ রোড, কলকাতা-১৪

aliahsanskriti@gmail.com, ৮৬৩৭০৮৬৪৬৯ (হোয়াটস্‌অ্যাপ)

স্পেনের ইতিহাস থেকেও শিক্ষা নিতে হবে

এ টি এম সাহাদাতুল্লা

পাক্ষিক আলিয়া, প্রথম বর্ষ প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত কাওসারুজ্জামান রচিত নিবন্ধ 'কবি হাস্‌সান-বৃত্তান্ত থেকে শিক্ষা নিতে হবে আমাদের', আমাদের ভাবিয়েছে। অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি রচনা। আজকের ক্ষয়িষ্ণু মুসলমান সমাজের সাপেক্ষে অত্যন্ত তাৎপর্যময়। কবি হাস্‌সান বৃত্তান্তকে সামনে রেখে সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে ফসল ফলানোর দিকে উপযুক্ত পরিমাণে নজর দেওয়া হলে মুসলমান সমাজের এত করুণ পরিণতি হতো না বলে আমাদেরও দৃঢ় বিশ্বাস। তবে এই বিশ্বাসের বেড়া ডিঙিয়ে আমরা আরও কিছু কথা বলতে চাই।

আমাদের মতে, সাংস্কৃতিকতার অস্ত্রে শান না দেওয়া মুসলমান সমাজের অধঃপতনের একমাত্র কারণ তো নয়ই; অন্যতম প্রধান কারণও নয়। তা যদি হতো তবে স্পেনের ইতিহাস অন্যরকম করে লেখা হতো। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, স্পেনে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল কমবেশি আট শত বছর। এই দীর্ঘসময়ে গোটা স্পেন জুড়ে চলেছিল সাংস্কৃতিকতার প্রগাঢ়চর্চা। তখনকার গ্রানাডা ও কর্ডোভা ছিল আজকের অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ সমতুল জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্র। প্রথাগত পড়াশুনার বাইরে এখানে শিল্প-সাহিত্য, স্থাপত্য, ভাস্কর্য প্রভৃতির চর্চাও চূড়ান্ত মাত্রা পেয়েছিল। অবশিষ্ট ইউরোপ থেকে তো বটেই, সমস্ত পৃথিবী থেকে এখানে শিক্ষার্থীরা আসতো পাঠ গ্রহণের জন্য। এত বিপুল সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের পরেও কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। বরং স্পেনেই মুসলমানদের সবচেয়ে করুণ পরিণতি হয়েছে। আক্ষরিক অর্থেই ইতিহাসের পাতায় মুখ লুকিয়েছে মুসলিম স্পেনের ইতিহাস। আজ সেখানে মুসলিমদের অস্তিত্ব নেই বললেই চলে। সেখানকার মসজিদগুলোকে রূপান্তরিত করা হয়েছে গীর্জায়। মুসলিম সমাজের এতটা বিপর্যয় বিশ্বের আর কোথাও হয়েছে বলে আমাদের জানা নেই।

কিন্তু কেন! উত্তরটা খুবই সহজ। সাংস্কৃতিকতা ইসলামের একটা দিক মাত্র। এর বাইরেও ঐশ্লামিক সত্যের অন্য অনেক দিক রয়েছে এবং সেগুলিই সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। ঐশ্লামিক সত্যের প্রথম ও শেষকথা ইমানদারিত্ব। আর ইমানদারিত্ব সাংস্কৃতিকতা নিরপেক্ষ না হলেও একান্ত সাপেক্ষ কোনো বিষয় নয়। আল্লাহতালার একত্ব ও তাঁর শ্রেষ্ঠত্বে ঐকান্তিক বিশ্বাস স্থাপন এবং নবী মুহম্মদ (স.) প্রতি প্রশ্নহীন আনুগত্য প্রদর্শনের অন্যনাম ইমানদারিত্ব। এই ইমানদারিত্বের জায়গায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে তবে অন্য সব দিকে প্রয়োজন মতো নিজেকে বিছিয়ে দিতে পারেন একজন ইমানদার। মূল জায়গায় যদি গলদ থেকে যায় তবে আর যাই কিছু করা হোক না কেন তা ব্যর্থ হতে বাধ্য। আর এটাই হয়েছিল স্পেনে মুসলিমদের ক্ষেত্রে। তারা ইমানদারিত্বের জায়গা থেকে সরে এসে পার্থিব প্রাপ্তি -অপ্রাপ্তিকে বড় করে দেখেছিল; সেই অনুসারে আত্মতৃপ্তির সলিলে নিশ্চিন্তে সন্তরণ করছিল। ইসলামে এমন আত্মতৃপ্তির কোনো জায়গা নেই। তাই, মুসলিম স্পেনের ইতিহাস আজ শুধুই ইতিহাস।

কেবল মুসলিম স্পেনের ইতিহাস কেন, অপরাপর সব ক্ষেত্র থেকেও যথেষ্ট শিক্ষা নেওয়ার আছে। উমাইয়া থেকে আব্বাসীয় যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত যে ইসলামের ইতিহাস তার ঔজ্জ্বল্যে ভাস্বর হয়েছিল সমকালীন বিশ্বমানব। বাদশা হারুন আর রশিদ, বাদশা মামুন প্রমুখের রাজত্বকালে বাগদাদ জ্ঞানবিজ্ঞানচর্চায় যে উচ্চতায় উপনীত হয়েছিল তার তুলনা আজকের পৃথিবীতে সুলভ নয়। এই বিপুল সমৃদ্ধির পরিণতি কী হয়েছে! উমাইয়া যুগের প্রাণকেন্দ্র সিরিয়া এখন যুদ্ধবাজদের আখড়া। সেখানে শিশু ও নারীর রক্তে সতত রাজপথ ধৌত হয়। সিরিয়াবাসীর আজ একটাই পরিচয়, তারা শরণার্থী। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়ে নিতান্ত অসম্মান জনক জীবন যাপন করছে তারা। এদিকে আব্বাসীয় সংস্কৃতির প্রধান ধারণ ক্ষেত্র ইরাক বা বাগদাদের পরিণতিও তথৈবচ। হালাকু খানের হাতে বিধ্বস্ত বাগদাদ আর কখনো সেভাবে মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনি এটা ঘটনা; কিন্তু এও সত্য যে, আজকের রক্তাক্ত বাগদাদ দুর্ধর্ষ ওই মঙ্গল নেতার দুঃসহ নিপীড়নের পরিণতি নয়। আজকের বাগদাদ সম্পূর্ণভাবে মুসলমানদের কৃতি বা কীর্তি।

সেই প্রথম দিন থেকে অদ্যাবধি মুসলমান সমাজের দেহ মনে এক দুরারোগ্য ব্যাধি বাসা বেঁধে রয়েছে; প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব। এই অন্তর্দ্বন্দ্বের কারণে বিভিন্ন সময়ে ঘোরতরভাবে বিপর্যস্ত হয়েছে তারা এবং আজও তার ব্যতিক্রম নেই। প্যালেস্তাইন সমস্যা তো রয়েছেই, তার বাইরেও নানা ঘটনার প্রেক্ষিতে মধ্যপ্রাচ্যে আগুন জ্বলছে তো জ্বলছেই। একদিকে সৌদি সরকারের বিমানবাহিনী গুড়িয়ে দিচ্ছে ইয়েমেনের অগণিত শিশু ও নারীর শির; অন্যদিকে লিবিয়ায় নতুন করে শুরু হয়েছে গৃহযুদ্ধ। এই গৃহযুদ্ধ, এতসব রক্তপাতের কারণ কী সাংস্কৃতিক সাক্ষরতার অভাব! আমাদের তা মনে হয় না। স্পেনের ক্ষেত্রেও তেমন কিছু হয়নি। একদিকে প্রবল অন্তর্দ্বন্দ্ব, অন্যদিকে আবশ্যক করণীয় থেকে সরে এসে উত্তর প্রজন্মের চূড়ান্ত বিলাসব্যসন উক্ত পরিণতিকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

সাংস্কৃতিক সাক্ষরতা কোনো জাতি-সংস্কৃতির অধিসৌধ বিশেষ; মূল ভিত্তি নয়। ইসলামি ধর্মাদর্শের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি করে সত্য। নবী মুহম্মদ (স.) তাঁর অনুগামীদের লেখাপড়ার উপর জোর দিয়েছিলেন ঠিকই, কিন্তু তার থেকে অনেক বেশি তৎপর হয়েছিলেন মুসলমানদের মধ্যে একাত্ম ও সৌভ্রাতৃত্বের বন্ধন রচনায়। পবিত্র কোরানেও এ বিষয়ে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। কিন্তু এসব কোনো কিছুই কোনো কাজে আসেনি। মুসলমানদের মধ্যেকার দ্বন্দ্বের সীমানা প্রসারিত হচ্ছে প্রতিদিন। সৌদি আরব তার প্রধান শত্রু হিসাবে জ্ঞান করছে আঙ্কারা বা তেহেরানকে। তেলআভিভ এর সঙ্গে তাদের মাখোমাখো সম্পর্ক বজায় আছে প্রথমাবধি। এই যদি কোনো জাতি সংস্কৃতির ভিতরকার সত্য হয়, তবে তাদের ধ্বংসের জন্য সাংস্কৃতিক সাক্ষরতা বা নিরক্ষরতা বিষয়টি কখনো গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না।

আজ পরিস্থিতি যেখানে উপনীত হয়েছে সেখান থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে কেবল সংস্কৃতির চর্চা করলে চলবে না; ইসলামকে তার স্বরূপে অনুধাবন করে নিজেদের জীবনে এর ফলিত রূপের ফসল ফলাতে হবে। ইসলামের প্রথম ও প্রধান কথা তৌহিদ তথা একত্ব। আল্লাহতালার একত্ব, মুসলমানিত্বের মৌলিকত্ব; এসবকে মুসলমান সমাজ যদি তাদের জীবনাচারের কেন্দ্রস্থলে প্রতিষ্ঠিত করতে না পারে তবে জাতীয় স্বার্থে নেওয়া তাদের সমস্ত কার্যক্রম ব্যর্থ হবে। প্রথম দিকের সেই দিনগুলিতে মুসলমানদের হাতে ইমানি শক্তির অতিরিক্ত বিশেষ কিছুই ছিল না। কিন্তু তা সত্ত্বেও সাফল্যকে করায়ত্ত করতে তাদের কোনো সমস্যা হয়নি। এই বিষয়টা আজ মুসলমান সমাজকে ভালো করে বুঝতে হবে। তবেই সমস্যার জাল ছিঁড়ে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাবে তারা।

একত্বের বোধে উজ্জীবিত হওয়া; অতঃপর ঐশ্লামিক সংস্কৃতির অপরাপর দিকের নিবিড় অনুসরণ—নামাজ-রোযা-হজ্ব-যাকাত; জ্ঞানচর্চা থেকে সংস্কৃতিচর্চা; সময়ের চাহিদা অনুসারে নিজেদের চিন্তা-চেতনার ক্ষেত্রকে প্রসারিত করা; এসব কিছুকেই একাধারে গ্রহণ ও ধারণ করতে হবে। এর মধ্যেকার কোনো কিছুকেই পরিত্যাগ করা চলবে না। সবচেয়ে বড় কথা, এসবের মধ্যে সুষ্ঠু সমন্বয় সাধন করতে হবে। কাজটা এমনিতে মোটেই সহজ নয়। কিন্তু ইমানদারের পক্ষে তা জলবৎ বলে মনে হতে পারে। কাজেই ইমানদারিত্বের সাধনাই হোক শেষকথা। আবারও বলার, এই ইমানদারিত্ব যেন কিছুতেই শুধুই নামাজ, রোযা, হজ্ব, যাকাত এসবে সীমায়িত না হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে, সময়ের চাহিদাকে গুরুত্ব দিয়ে সেই অনুসারে নিজেকে রচনা করাও ইমানদারিত্বের অন্যনাম।

(অধ্যাপক, গ্রন্থকার। sahadat86@gmail.com)

সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননী : একটি ভ্রান্ত ও উদ্দেশ্যপ্রণোদিত কথন

রমজান আলি

যতদূর মনে পড়ে, পঞ্চম শ্রেণিতে পড়ার সময় বক্তব্যটির সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ; সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননী। তারপর গোটা স্কুলজীবনে একাধিকবার শিক্ষকদের কণ্ঠে কথাগুলি উচ্চারিত হতে শুনেছি। বিদ্যালয়ের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে পা রাখার পরেও নতুন কোনো কথা সেভাবে শোনা যায়নি। বলা যায়, স্নাতকোত্তর শ্রেণিতে আলাদা করে ভাষা বিষয়ে অতিরিক্ত মনোযোগী হওয়ার প্রেক্ষিতে বোধের আঙিনায় ভারতীয় আর্যভাষার ক্রমবিবর্তনের রূপরেখাটা বেশ স্পষ্ট রূপে ছায়াপাত করে; আর তারই সূত্রে সত্যের উত্তাপে তপ্ত হওয়ার সুযোগ মেলে। সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননী নয়; এ সম্মান যদি কোনো ভাষার প্রাপ্য হয় সে মাগধী অপভ্রংশ-অবহট্ঠ। ইতিহাস ও ইতিহাসের ইতিহাসটা এক্ষেত্রে এইরকম।

প্রাচীন-মধ্য-আধুনিক, ভারতীয় আর্যভাষার তিনটি প্রধান স্তর বা যুগ। প্রথম যুগ অর্থাৎ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার স্তরেই বহিরাগত আর্য জাতির ভাষা-সংস্কৃতির সঙ্গে স্থানীয় অনার্য জাতির ভাষা-সংস্কৃতির সংমিশ্রণের সূত্রপাত হয়। এই মিশ্রণের সূত্রে দ্রুত বদলে যাচ্ছিল ভারতীয় আর্যভাষা। কালক্রমে এই বদল বৃত্তান্তের অনিবার্য অভিঘাত হিসাবে জন্ম হয়েছিল মধ্য ভারতীয় ও আরও পরে আধুনিক ভারতীয় আর্যভাষার। সেখানে আর্যভাষার সঙ্গে অনার্য ভাষার মেলবন্ধন ঘটেছিল পর্যাপ্ত পরিমাণে। যা প্রথমাবধি না পছন্দ ছিল আর্যকুলপতিদের। তারা একেবারেই চাইছিলেন না, তাদের মাতৃভাষা দেশীয় অনার্যদের ভাষার সংস্পর্শে এসে এভাবে বদলে যাক বা বিকৃত হোক। ফলত, নানাভাবে সচেষ্ট হয়েছিলেন তারা। তাদের এই প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি হলো সংস্কৃত ভাষা।

মহামুনি পাণিনি আদর্শ বা মান্য আর্যভাষার বৈশিষ্ট্য সমূহকে চিহ্নিত করে সেগুলিকে সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। তাঁর অষ্টাধ্যায়ী সমাপ্ত হওয়ার পর সমাজপতিদের পক্ষ থেকে ঘোষণা দিয়ে বলা হয়েছিল, অতঃপর যারা আর্যভাষার চর্চা করবেন তাদেরকে অষ্টাধ্যায়ী নির্দেশিত সূত্রাদি অনুসরণ করতে হবে; এর বাইরে যাওয়া চলবে না। তাদের এই নির্দেশ এমনিতে মান্যতা পেয়েছিল সেদিনের আর্যসমাজে; কিন্তু অনিবার্য কিছু কারণে এই মান্যতার সীমানা দিগন্ত স্পর্শ করতে পারেনি। ভাষার কলেবর গঠিত হয় দুটি প্রধান রূপ সহযোগে—কথ্য এবং লেখ্য। দুই রূপের মধ্যে লেখ্যরূপকে বাইরে থেকে সহজে নিয়ন্ত্রণ করা যায়; কিন্তু কথ্যভাষাকে ওভাবে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়; এটা করা অসম্ভব প্রায়। ভারতীয় আর্যভাষার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। আর্যসমাজ লেখ্যভাষার ক্ষেত্রে পাণিনি নির্দেশিত সূত্রাদি নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে সক্ষম হলেও কথ্যভাষার বেলায় তা একেবারেই করা যায়নি। ততদিনে সামাজিক সংমিশ্রণের ধারা অনেক দূর পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়েছে। অনার্যসমাজ যেমন আর্যভাষাকে তাদের ব্যবহারিক জীবনে প্রয়োগ করতে শুরু করেছে, তেমনি ঘনিষ্ঠ অনার্য সাহচর্যের কারণে সাধারণ আর্য-সমাজ তাদের নিজস্ব ভাষার বেদীমূল থেকে অনেকটা বিচ্যুত হয়েছে। এই অবস্থায় তাদের পক্ষে কথ্যভাষায় আর্যভাষার মৌলিকত্ব পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করা ছিল নদীর স্রোতকে উল্টো দিকে প্রবাহিত করানোর মতোই অসম্ভব ব্যাপার। সঙ্গত কারণে তারা এই চেষ্টায় ব্রতী না হয়ে লেখ্যভাষার শুদ্ধতা রক্ষার দিকে অধিক যত্নশীল হয়েছিলেন; চেষ্টা করেছিলেন এখানে পাণিনি নির্দেশিত সূত্রাদিকে নিষ্ঠার সঙ্গে অনুসরণ করতে। এতে লেখ্য আর্য ও মৌখিক আর্যভাষার মধ্যে বিস্তর ব্যবধান দাঁড়িয়ে যায়। লেখ্যভাষা একান্তভাবে আর্যভাষার নিজস্ব ভাষা-বৈশিষ্ট্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয় ; অন্যদিকে কথ্যভাষায় অনার্য ভাষার অনেক উপাদান যেমন মিশে যায় তেমনি ব্যাকরণিক সংবর্গের ক্ষেত্রেও ঘটে অনেক অদলবদল। পাণিনির ব্যাকরণের বাঁধনে কোনোভাবেই বাঁধা যায় না এ ভাষাকে।

উল্লেখ্য, প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষার লেখ্যরূপের অন্যনাম সংস্কৃত ভাষা। এ ভাষা সম্পূর্ণত কৃত্রিম; কোনোদিনই তা মানুষের মুখের ভাষা হয়ে ওঠেনি; সেই অর্থে এর কোনো বিবর্তনও হয়নি। ভাষাতত্ত্বের সামান্য জ্ঞান যাদের আছে তারাও জানেন এমন অবিবর্তিত লেখ্যভাষা থেকে কোনো নতুন ভাষার জন্ম হতে পারে না; বাংলা ভাষার ক্ষেত্রেও তা হয়নি। বাংলা ভাষার জন্ম হয়েছে ভারতীয় আর্যভাষার সেই কথ্যরূপের ক্রমবিবর্তনের প্রেক্ষিতে যা বহুদিন আগেই এর আর্যত্ব থেকে বিচ্যুত হয়েছিল; যেখানে অনার্যভাষার হাজারও ভাষিক উপাদান মিশে গিয়েছিল।

প্রাজ্ঞজনরা বিশ্লেষণ সহযোগে প্রতিপন্ন করেছেন, ছয়শো খ্রিস্ট পূর্বাব্দ নাগাদ প্রাচীন ভারতীয় আর্যভাষা মধ্যভারতীয় আর্যভাষায় রূপান্তরিত হয়েছিল এবং প্রায় পনেরোশো বছরের মতো বিস্তৃত হয়েছিল এর পরিসর। দীর্ঘ এই কালসীমার শেষপর্বে (৬৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ) পূর্বভারতে অর্থাৎ আমাদের এই বঙ্গদেশ অঞ্চলে মাগধী অপভ্রংশ নামে একটি আঞ্চলিক ভাষা প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। এই মাগধী অপভ্রংশ ভাষার পূর্বী শাখার প্রাচ্যরূপ থেকে কালক্রমে উদ্ভব হয়েছিল বাংলা ভাষার।

বাংলা ও সংস্কৃত দুটি ভাষার মধ্যে কালগত ব্যবধান বহু যোজনের। পাণিনির সময়কাল সুনির্দিষ্ট নয়। তবে তিনি খ্রি. পূর্বাব্দের মানুষ তা নিয়ে প্রাজ্ঞজনদের সকলেই প্রায় একমত। তাই যদি হয় তাহলেও দুটি ভাষার মধ্যে কালগত ব্যবধান দাঁড়ায় কমপক্ষে সাত শত বছরের। এই সাত শত বছর যাবৎ একই স্থানে অবিবর্তিতভাবে দাঁড়িয়ে থাকা, বিশেষত কোনো লেখ্যভাষার গভীর থেকে বাংলার মতো একটি জীবন্ত ভাষার জন্ম হওয়া অসম্ভব। এমন ধারণাকে উদ্ভট বললেও কম বলা হয়।

এখন প্রশ্ন, এমন উদ্ভট ধারণা কীভাবে জনমানসে প্রতিষ্ঠা পেল। আমাদের মতে, এর মূলে রয়েছে নবচেতনা প্রসূত উনিশ শতকীয় বাঙালির রূপান্তরিত মূল্যবোধ। এই সময় বাঙালি হিন্দু সমাজে যে প্রবল ধর্মীয় জাতীয়তাবোধের জাগরণ ঘটেছিল তার প্রভাবে প্রশ্রয় পেয়েছিল বাংলা ভাষা বিষয়ক এই ভ্রান্ত ধারণা। সেদিন অগ্রসর বাঙালি হিন্দু সমাজ আরও অনেক কিছুর মতো বাংলা ভাষাকেও তাঁদের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার হিসাবে দেখতে চেয়েছিলেন। এই চাওয়া থেকেই তাঁরা বলতে শুরু করেছিলেন, যে সংস্কৃত ভাষা থেকে বাংলা ভাষার উদ্ভব হয়েছে। বাংলা ভাষায় সংস্কৃত শব্দের আধিক্য এক্ষেত্রে তাঁদের বক্তব্যকে কিছুটা ভিত্তি দিয়েছিল। সাধারণের পক্ষে এই ভিত্তিমূলে আঘাত করে প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করা সম্ভব হয়নি। তারা জোর দিয়ে বলতে পারেননি, শব্দ ভাষার ক্ষেত্রে নিতান্ত বাইরের বিষয়; এক্ষেত্রে প্রথম ও প্রধান কথা হলো ব্যাকরণিক সংবর্গ; বাংলা ভাষার সঙ্গে যেখানে সংস্কৃত ভাষার বিস্তর ব্যবধান রয়েছে। বাংলা ভাষার উৎপত্তি সম্পর্কিত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ-র মতো প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের বক্তব্য তাই নিছকই মুদ্রিত থেকে যায় বই এর পাতায়।

সংস্কৃত বাংলা ভাষার জননী নয়। সংস্কৃতকে বাংলা ভাষার দূর সম্পর্কের আত্মীয় বা বড়োজোর সহোদরা বলা যেতে পারে। এদিকে অবস্থাটা আজ যে জায়গায় দাঁড়িয়ে রয়েছে তার প্রেক্ষিতে সাধারণকে নতুন করে কিছু বোঝান সহজ নয়। মনে রাখতে হবে, এই না পারাটা হয়তো তেমন দোষের নয়। তবে যে ব্যবস্থাপনার মধ্যে দিয়ে এখনও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাক্ষেত্রে, বিশেষত উচ্চতর শ্রেণিতে পাঠরত বাংলা পড়ুয়াদের মনে এমন ভুল ধারণাকে জিইয়ে রাখা হয় তা অশুভ এবং বিপজ্জনক।

(শিক্ষক, গ্রন্থকার। ramjanacademy@gmail.com)

শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দি : সম্প্রীতির মশাল যাঁর হাতে চির দেদীপ্যমান ছিল

আলিমুজ্জমান

বাঙালির জাতীয় ইতিহাসে যে সব খলনায়কের উজ্জ্বল উপস্থিতি রয়েছে শহীদ হোসেন সোহরাওর্য়াদি তাদের একজন; এটা মনে করেন অনেকেই। তাদের মতে 'The Great Calcutta Killing' এর প্রথম ও প্রধান কারিগর হোসেন সোহরাওর্য়াদি। এই মনে হওয়া কতটা বাস্তব আর কতটা মন গড়া তা নিয়ে অদ্যাবধি অনেক কথা হয়েছে; হয়েছে স্বতন্ত্র গবেষণামূলক অনুসন্ধান। এই অনুসন্ধান থেকে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়েছে, ছেচল্লিশের দাঙ্গার দায় কিছুতেই আলাদা করে শহীদ সোহরাওার্দিতে বর্তায় না। এক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা অনেকাংশে মহাত্মা গান্ধীর অনুরূপ। গান্ধীজীকে যেমন সমস্ত সত্তাদিয়ে দেশভাগের বিরোধিতা করার পরেও শেষাবধি দেশভাগের দায় মাথায় নিয়ে মরতে হয়েছিল, তাঁকেও তেমনি সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে বরাবর আপোষহীন অবস্থানে দৃঢ় থাকার পরেও সর্বাঙ্গে মাখতে হয়েছিল সাম্প্রদায়িকতার দূষিত রক্ত।

বিশ শতকের দুই এর দশকে বাংলার রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা ছিল জটিলতাময়। হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক একেবারে তলানিতে এসে ঠেকেছিল। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ মুসলিম; এদিকে ক্ষমতার কেন্দ্রে হিন্দুদের একাধিপত্য। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রসূত জমিদারি প্রথা তখন স্থায়ী ভিত্তি পেয়েছে। জমিদারদের অধিকাংশই হিন্দু সম্প্রদায়ভুক্ত। তাদের শাসনে শোষণে সাধারণের অর্থনৈতিক অবস্থা চরমে পৌঁছেছে। এদিকে নতুন জমিদারি ব্যবস্থার উপজাত হিসাবে মহাজনি ব্যবসা বেশ জমে উঠেছে; আর মহাজনদেরও প্রায় সকলেই হিন্দু। এইসব মহাজনরা সাধারণ খেটে খাওয়া হত দরিদ্র মুসলমানদের সামান্য জমিজমা ভিটে মাটিটুকুও ছলে বলে কৌশলে হাতিয়ে নিয়েছে। স্বসমাজের এমন অসহনীয় অবস্থার প্রেক্ষিতে বিচলিত হন সেদিনের মুসলিম নেতৃবৃন্দ। তাঁরা এখান থেকে উত্তরণের পথ অন্বেষণ করতে শুরু করেন। তাঁদের এই অন্বেষণ বিশেষ মাত্রা পায় খিলাফত আন্দোলনের নেতা আলী ভাইদের প্রত্যক্ষ অনুপ্রেরণায়।

এমন আর্থ-সামাজিক অবস্থার প্রেক্ষিতে ছাব্বিশ বছরের যুবক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দি ইংল্যান্ড থেকে ব্যারিস্টার হয়ে দেশে ফিরে আসেন। দেশে ফিরে কলকাতা হাইকোর্টে শুরু করলেন আইন ব্যবসা। আইন ব্যবসার পাশাপাশি ক্রমশ সক্রিয় রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়তে দেখা গেল তাঁকে। একটা সময়ে কাঁধে তুলে নিলেন কলকাতা খেলাফত কমিটির সেক্রেটারির দায়িত্বভার। এই পথে ১৯২১ সনে বেঙ্গল লেজিস্লেটিভ অ্যাসেম্বলির সদস্য নির্বাচিত হলেন। 'অ্যাসেম্বলি হাউসে' শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দির ব্যক্তিত্ব ও বাক্‌পটুতা মুগ্ধ করলো কংগ্রেস সদস্যদের। কংগ্রেসি রাজনীতিতে তখন হিন্দু-মুসলমানের সমন্বয় ভাবনায় ভাস্বর দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের অপ্রতিহত প্রাধান্য। তিনি শহীদ সোহরাওয়ার্দিকে গভীর স্নেহের সঙ্গে কাছে টেনে নিলেন।

বেঙ্গল প্যাক্ট এর অভিঘাতে দেশবন্ধুকে কংগ্রেস ত্যাগ করে স্বরাজ পার্টি তৈরি করতে হলো। সোহরাওয়ার্দি হলেন এই নতুন দলের ডেপুটি লিডার। অতঃপর ১৬ জুন ১৯২৫, দেশবন্ধুর অকাল মৃত্যু। মুহূর্তে সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল। হোসেনকে ফিরে আসতে হলো কংগ্রেসি রাজনীতির অঙ্গনে। প্রত্যাবর্তন করলেন এবং আবারও স্বমহিমায় প্রতিভাত হলেন। কিন্তু সমস্যা পিছু ছাড়লো না। ১৯২৬ এর দাঙ্গার সময় সোহরাওয়ার্দি মুসলমান এলাকায় হিন্দুদের এবং হিন্দু এলাকায় মুসলমানদের জীবন ও সম্পদ রক্ষার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করে গেলেন; কিন্তু তা সত্ত্বেও তাঁর নামে অপপ্রচার চালানো হলো। এই অন্যায়ের প্রতিবাদ স্বরূপ কলকাতা করপোরেশনের ডেপুটি মেয়রের পদ থেকে পদত্যাগ করলেন তিনি। মনটা ভেঙে গিয়েছিল এখান থেকেই। পরে সিমলা সম্মেলনের ব্যর্থতার প্রেক্ষিতে আনুষ্ঠানিকভাবে কংগ্রেস ত্যাগ করলেন। ক্রমশ তার পরিচয় গেল পাল্টে। উদার অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির মহান সাধক এখন মুসলমান সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক নেতা।

শহীদ হোসেন সোহরাওর্য়াদি মুসলমান সমাজের রাজনৈতিক নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত হলেন বটে, কিন্তু এখানেও মোটেই সুবিধা করতে পারলেন না। রক্তে যাঁর অসাম্প্রদায়িক চেতনা সতত হিল্লোল তোলে তিনি কেমন করে সাম্প্রদায়িকতার তাস খেলে যাবেন নিপুণ হাতে। তাই আবারও বে-নজিরভাবে বাড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টা করলেন সৌহার্দ্যের হাত। ১৯৪৬ এর নির্বাচনে বাঙলায় তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এককভাবে সংখ্যা গরিষ্ঠতা অর্জন করলেও তিনি কংগ্রেসের সাথে যুক্ত মন্ত্রিসভা গঠনের প্রস্তাব করেন। তাঁর মনে হয়েছিল, ১৯৩৭ সন থেকে হিন্দু সম্প্রদায় বাঙলার শাসনক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করতে না পারায় তাদের মধ্যে অসন্তোষ সৃষ্টি হয়েছে। এই অসন্তোষের নিরসন জরুরি। সৌহার্দ্যের হাত বাড়ান হলো বটে কিন্তু উল্টো দিক থেকে কোনো সাড়া পাওয়া গেল না। কংগ্রেস হাইকমান্ড যুক্ত মন্ত্রিসভা গড়ার প্রস্তাব নাকচ করে দিলেন। বাধ্য হয়ে সোহরাওয়ার্দিকে এককভাবে সরকার গঠন করতে হলো। আর তারপরেই ঘটানো হলো অথবা ঘটে গেল 'The Great Calcutta Killing'. ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকার অপরাধে এর সব দায় গিয়ে চাপলো তাঁর উপর। এই দায় থেকে অদ্যাবধি তাঁকে মুক্তি দেওয়া হয়নি। অথচ এমন অপবাদ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য তিনি কী না করেছিলেন; করার চেষ্টা করেছিলেন।

সাতচল্লিশের দেশভাগের পর 'মন্ত্রীত্বের লোভনীয়' প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে থেকে গেলেন সীমান্তের এপারে। যে দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশভাগ হল তার উচ্ছেদ সাধনের প্রস্তাব করলেন সরবে। জাতীয় ঐক্য প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে পাকিস্তানে মুসলিম লীগ সরকারের পরিবর্তে জাতীয় সরকার গঠনের পরামর্শ দিলেন। কিন্তু পদদলিত হলো তাঁর এসব প্রস্তাব। পরিবর্তে নানা অকথা, কুকথার জাল বিছানো হতেই থাকলো । কেউ কেউ তাঁকে রীতিমতো পাকিস্তানের চর বলে জ্ঞান করতে শুরু করলেন। এমন অবস্থায় একটা সময়ে সীমান্তের এপারে থাকা অসম্ভব প্রায় হয়ে দাঁড়াল। বাধ্য হয়ে ১৯৪৯ নাগাদ প্রথমবারের জন্য সীমান্তের বেড়া ডিঙালেন শহীদ হোসেন সোহরাওর্য়াদি। পাকিস্তানে এসে কাঙ্ক্ষিত ফললাভ হবে না, এ তিনি ভালোকরেই জানতেন। সেই অনুসারে মানসিকভাবে তৈরি হয়েই এসেছিলেন। কিন্তু তবুও সত্যের ভার বইতে পারলেন না। বাস্তবের তিক্ততা অনুমানের সীমানা পেরিয়ে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত হলো। তিনি বুঝতে পারলেন আর কোনো আশা নেই।

চোখের সামনে একটার পর একটা সম্ভাবনার দীপ নিভে গেলে কোনো সংবেদনশীল ব্যক্তিই আর বেঁচে থাকার লক্ষ্যে প্রাণিত হতে পারেন না। শহীদ হোসেন সোহরাওয়ার্দিও পারেননি। তিনি তখন শুধুই অপেক্ষা করছেন শেষের ঘণ্টা শোনার জন্য। ঘণ্টা বাজলো যথাসময়ে (৫ ডিসেম্বর, ১৯৬৩)। এক বুক ব্যথা নিয়ে এপারের পাঠ চুকিয়ে পরপারের উদ্দেশ্যে পাকাপাকিভাবে যাত্রা করলেন। যাত্রাকালে উত্তর প্রজন্মের জন্য রেখে গেলেন একটি জিজ্ঞাসা; কোন্ পথে সাম্প্রদায়িকতার অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব! বলা বাহুল্য আজও আমরা এই জিজ্ঞাসার ভার বহন করছি।

গ্রন্থঋণ

১। গণতন্ত্রের মানসপুত্র হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, সিরাজ উদ্‌দীন আহমেদ
২। কৃষ্ণ যোলোই, মীজানুর রহমান
৩। অসমাপ্ত আত্মজীবনী, শেখ মুজিবুর রহমান

(শিক্ষক, প্রাবন্ধিক। alimuzzaman4@gmail.com)

সাগরপারের কালো মানুষদের কথা

সুমিতা দাস

"যখন আমি ভাবি যে ঈশ্বর ন্যায়পরায়ণ এবং তাঁর ন্যায়দণ্ড চিরকাল ঘুমিয়ে থাকবে না, তখন আমি আমার দেশের জন্য ভয়ে কাঁপি।" দাস প্রথার প্রেক্ষিতে কথাটা বলেছিলেন টমাস জেফারসন; মার্কিন সংবিধানের প্রণেতা ও দেশের তৃতীয় প্রেসিডেন্ট। আফ্রিকা থেকে আগত কালো মানুষ ও তাদের উত্তরসূরীরা তখন ক্রীতদাস হিসেবে অবর্ণনীয় দুর্দশার শিকার; তাদের মানুষ বলেই মনে করা হয় না। এই ভয়ানক অন্যায় ঈশ্বর সহ্য করবেন না, এটাই ছিল জেফারসনের বক্তব্য। এতসব কথার পরেও জেফারসন তাঁর অধীনস্থ ছ'শো দাসের কাউকেই মুক্তি দেননি। ক্রীতদাসীর গর্ভে বেশ কিছু সন্তানের পিতা হয়েছিলেন তিনি। এইসব সন্তানরাও মুক্তি পায়নি; তাদের পালিয়ে যেতে সাহায্য করা হয়েছিল মাত্র।

মার্কিন দেশের কালো মানুষদের সংকটকে বুঝতে গেলে জেফারসনের জীবনের এই বৈপরীত্যকে বুঝতে হবে। ইংরেজদের নাগপাশ ছিন্ন করে সদ্য স্বাধীন (১৭৭৬) হওয়া মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ঘোষণা করেছিল, মানুষের তিনটি অধিকার কখনই ছিনিয়ে নেওয়া যায় না—জীবনের অধিকার, মুক্তির অধিকার আর সুখের সন্ধানে যাত্রার অধিকার। অথচ স্বাধীনতা যুদ্ধের পরেও ওদেশে নতুন নতুন ক্রীতদাস পৌঁছনোর বিরাম ছিল না।

এই সময়ে ব্রিটেনে ঘটে গেছে শিল্পবিপ্লব। আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রধান রপ্তানি পণ্য হয়ে উঠেছে তুলো। শিল্পবিপ্লবের কাঁচামাল এই তুলো উৎপাদন করবে কৃষ্ণাঙ্গ ক্রীতদাসেরা। ঊনবিংশ শতকের প্রথম পঁচিশ বছরে তাই স্বাধীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ক্রীতদাস হিসেবে এসে পৌঁছায় আরও এক লক্ষ আফ্রিকাবাসী। স্বাধীন মার্কিন দেশে ক্রীতদাস প্রথা শুধু টিকেই থাকে না, শিল্পবিপ্লব ও তুলো চাষের হাত ধরে তার বাড়বাড়ন্ত হতে থাকে।

বলা হতে পারে, এ তো অনেক দিন আগের কথা। আজ তো আর দাসপ্রথা নেই। তা ঠিক, এখন দাসপ্রথা নেই। যেমন আমাদের দেশে এখন আর লিঙ্গ-ধর্ম-জাতি-বর্ণের ভিত্তিতে পেশা নির্দিষ্ট হয় না। কিন্তু বড়ো চাকুরেদের যে কোনও তালিকা দেখুন, দেখবেন সেখানে হিন্দু উচ্চবর্ণের পুরুষদের কী অসম্ভব আধিক্য। আশা করি কেউ বলবেন না, সেটা শুধু তাদের উচ্চ মেধার কারণে। ইতিহাস বর্তমানের মধ্যে এভাবেই প্রভাব বিস্তার করে থাকে।

ফিরে যাওয়া যাক মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে; সেখানে ইউরোপীয়রা প্রথম কলোনি গড়ে চাষবাস শুরু করে, ভার্জিনিয়ার জেমস টাউনে, ১৬০৭ সনে। এর মাত্র বারো বছর পরই সেই জেমস টাউনে আফ্রিকা থেকে প্রথম ক্রীতদাস আনা হয়। তখন থেকেই সেখানে চাষবাস, বাড়িঘর ও শহর গড়ার কাজ করেছে আফ্রিকা থেকে আনা এইসব মানুষ ও পুরুষানুক্রমে তাদের সন্তানসন্ততিরা। পুরুষানুক্রমে কথাটা অবশ্য ভুল। আসলে, নারী-অনুক্রমে। কারণ, ক্রীতদাসীদের গর্ভজাত সব সন্তানই হত দাস-দাসী। তাদের পিতা কৃষ্ণাঙ্গই হোক বা শ্বেতাঙ্গ। ক্রীতদাস প্রথা বহুদিনের। কিন্তু এই নিয়মটা মার্কিন দেশের নিজস্ব। তাই ১৮০৮ সনে বাইরে থেকে ক্রীতদাস আনা আইন করে বন্ধ করা হলেও ক্রীতদাসের সংখ্যা কমেনি, বরং বেড়েই গেছে। তার পরিধিও বেড়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন দখল করা এলাকাতেও শুরু হয়েছে প্ল্যান্টেশনে ক্রীতদাস-ভিত্তিক চাষ। ভার্জিনিয়াতে ক্রীতদাসীর গর্ভজাত সন্তানদের বেচে দেওয়া হয়েছে, পাঠানো হয়েছে ওইসব নতুন জায়গায় লুইসিয়ানা, মিসিসিপি, পশ্চিম ভার্জিনিয়া প্রভৃতিতে। "Deep South" শব্দটা শুনলে তখন ক্রীতদাসের বুক কাঁপত। কারণ, যে কোনও সময়ে তাদের বা তাদের প্রিয়জনদের, স্বামী-স্ত্রী বা সন্তানদের, পাঠিয়ে দেওয়া হতে পারে সেই অজানা অন্ধকারে। সেখান থেকে আর কোনোদিন তাদের কোনও খবর পাওয়া যাবে না।

এদিকে ইউরোপে অষ্টাদশ শতক থেকেই ক্রীতদাস প্রথার বিরুদ্ধতা শুরু হয়েছে। সেখানে স্বাধীন মজুর, আর শোষণ ভিত্তিক পুঁজিবাদ হয়ে উঠেছে নতুন যুগের ডাক। শেষপর্যন্ত ১৮৩৩ সনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ক্রীতদাস প্রথা আইন করে বন্ধ করা হলো। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তো তখন আর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়; স্বাধীন দেশ। সেখানে তাই ক্রীতদাস প্রথা চলতেই থাকল। বিশেষ করে দক্ষিণের কৃষি-ভিত্তিক রাজ্যগুলিতে। ক্যারিবিয়ান দেশগুলিতেও তখন দাসপ্রথা বন্ধ হয়ে গেছে, কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তা রমরম করে চলছে। উত্তরের রাজ্যগুলিতে অবশ্য তখন ইউরোপের অনুসরণে শিল্প গড়ে উঠছে। সেখানে স্বাধীন শ্রমজীবীর শ্রম -বিক্রয়কেই শ্রেয় মনে করা হচ্ছে; দাসব্যবস্থাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। দাসব্যবস্থা বিরোধী আন্দোলনও গড়ে উঠছে। কিন্তু কেন্দ্রীয় ফেডারেল সরকার যখন আইন করে দাসব্যবস্থা বন্ধ করতে চাইল তখন দক্ষিণের রাজ্যগুলো তা মানলো না। সেখানকার কর্তাব্যক্তিরা মার্কিন দেশ থেকে আলাদা হয়ে গিয়ে নিজেদের জোট গড়ল। ফলে বাধল যুদ্ধ। আমরা জানি, সে যুদ্ধে আব্রাহাম লিঙ্কনের নেতৃত্ব ইউনিয়নপন্থীরা জয়লাভ করেছিল এবং তারই ফলে ১৮৬৫ সনে দাস ব্যবস্থার অবসান ঘটলো।

দাস প্রথার অবসান ঘটল। কিন্তু কৃষ্ণাঙ্গ আমেরিকানরা ইউরোপ থেকে আসা শ্বেতাঙ্গদের সমান বলে গণ্য হলো না। তারা সেই সর্বহারা। কানাকড়িও নেই পকেটে, মাথার ওপর ছাদ নেই, শিক্ষা নেই। ইউরোপীয়দের জন্য যেমন আদি আমেরিকাবাসীদের জমি জবরদখল করে তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল, এদের ক্ষেত্রে সেরকম কিছু করা হয়নি। তাদের ছিল শুধু দু-খানা হাত। এই হাত দুটি সম্বল করে ক্ষুণ্নিবৃত্তি করতে গিয়ে দেখা গেল পরিচয় ও চেহারা তাদের কাছে বড়ো বাধা। একবারে নিচের স্তরের কাজ ছাড়া তাদের অন্য কোনো কাজ দিতে নারাজ সাদা চামড়ারা। সাদাদের পাড়ায় তাদের থাকতে দেওয়া হবে না। সাদাদের স্কুলে তাদের পড়তে দেওয়া হবে না। কাছাকাছি কোনো অপরাধ ঘটলে বা ঘটেছে বলে অভিযোগ এলে পুলিশ তাদের ধরে নিয়ে যাবে। তাদের সাক্ষ্যের কোনো মূল্য নেই, জুরিদের মধ্যে তাদের কোনো প্রতিনিধি নেই; জর্জ সাহেবও শ্বেতাঙ্গ। ফলে বিনা দোষে তারা দোষী সাব্যস্ত হয়; অল্প দোষে বড়ো শাস্তি পায়।

একদিকে সাদা মানুষদের ঘৃণা, অন্যদিকে আইনি বঞ্চনা। লড়াই করার পথে এই দুই পাহাড় ঠেলেও এগিয়ে চলছিল কৃষ্ণাঙ্গরা। কিন্তু এরপর এলো ১৯১৯-২০ সন। রায়টের বছর। যেখানে যেখানে কালো মানুষরা নিজেদের পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে বসতি, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান প্রভৃতি গড়ে তুলেছে, সেসব জায়গায় রায়টের হাত ধরে চললো হত্যাকাণ্ড, লুণ্ঠন, অগ্নিসংযোগ।

দক্ষিণের প্রদেশগুলিতে যেহেতু দাসব্যবস্থা নিবিড়ভাবে ও বেশিদিন ধরে প্রচলিত ছিল, তাই ভূতপূর্ব দাস ও তাদের উত্তরসূরিরা সেখানেই ছিল বেশি সংখ্যায়। মানুষের মতো বাঁচার তাগিদে ১৯২০ সন থেকে তারা দলে দলে উত্তরের রাজ্যগুলিতে যাত্রা করে। এই যাত্রা চলে ১৯৭০-এর দশক পর্যন্ত। এর নাম Great Migration। কিন্তু উত্তরে এসেও তাদের সমস্যার সমাধান হলো কি? হলো না। ম্যালকম এক্স হত্যা থেকে জন ফ্লয়েড হত্যা সে কথাই বলে। প্রদীপের নিচে এ কোন অন্ধকার!

(ডাক্তার, গ্রন্থকার। sumitapurba@gmail.com)

দার্শনিক আল কিন্দি

শামিম আহমেদ

আল কিন্দি (৮০১-৮৭৩) নবম শতাব্দীর দার্শনিক ব্যক্তিত্ব। তিনি কালাম ও ফালাসাফা নিয়ে চর্চা করেছেন। আল কিন্দি মূলত অ্যারিস্টটলপন্থী দার্শনিক। তাঁর পুরো নাম আবু ইউসুফ ইয়াকুব ইবনে ইসহাক। তিনি কিন্দা গোষ্ঠীর মানুষ। বহুমুখী প্রতিভাধর আল কিন্দি ছিলেন দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, জ্যোতির্বিজ্ঞানী, বিশ্বতত্ত্ববিদ, পদার্থবিদ, সঙ্গীতজ্ঞ, মনোবিজ্ঞানী ও আবহাওয়াবিজ্ঞানী।

আব্বাসীয় খলিফারা আল কিন্দিকে গ্রিক বিজ্ঞান ও দর্শনসমূহ আরবিতে অনুবাদ করার দায়িত্ব দিয়েছিলেন। এই কাজ করতে করতে আল কিন্দির মৌলিক চিন্তা প্রকাশিত হতে থাকে এবং তিনি সারা জীবনে অসংখ্য বই লেখেন। জ্ঞানের স্বরূপ বিশ্লেষণ করে আল কিন্দি বলেন, জ্ঞানকে সম্পূর্ণ গাণিতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হতে হবে এবং জ্ঞানের মানদণ্ড হবে স্পষ্টতা। পরবর্তীকালে ফরাসি দার্শনিক রেনে দেকার্ত এমন কথা বলে আধুনিক দর্শনের জনক হিসাবে প্রতিষ্ঠা পান।

যুগ স্রোতে গা ভাসিয়ে আল কিন্দি ফেইথ বা বিশ্বাসের উপর দর্শনচর্চাকে ছেড়ে দেননি। তিনি যুক্তিবুদ্ধির উপর নির্ভর করে তাঁর দর্শন ভাবনার সৌধ রচনা করেন এবং অর্জিত জ্ঞানকে যথাযথভাবে লিপিবদ্ধ করে যান। কুফাতে জন্মগ্রহণ করেন এই মহান দার্শনিক। গণিত শাস্ত্রে ভারতীয়দের অগাধ পাণ্ডিত্য তাঁকে মুগ্ধ করে। তিনি ভারতীয় সংখ্যাগুলিকে ইসলামীয় জগতে নিয়ে আসেন; সেখান থেকে খ্রিস্টীয় জগতে গণিতের এই ভাবনা প্রবেশ করে। আরবদের মাধ্যমে পাওয়া ভারতীয় গণিতবিদ্যাকে ব্যবহার করে উত্তরকালে ইউরোপ জ্ঞানবিজ্ঞান চর্চায় বিপ্লব নিয়ে আসে। উল্লেখ্য, আল খারিজমিও গণিত বিদ্যাচর্চা বিষয়ে অন্যতম পথিকৃৎ ছিলেন।

কিন্দা গোত্রের এক অভিজাত পরিবারে জন্ম গ্রহণকারী আল কিন্দি পারিবারিক ঐতিহ্য অনুসরণে তাঁর দর্শনচর্চাকে ধর্মতত্ত্বের সঙ্গে সংযুক্ত করে অনুশীলন করেন। আল্লাহ-র প্রকৃতি, রুহ এবং ভবিষ্যৎবাণীর ব্যাপারে তাঁর মৌলিক বিশ্লেষণের পরিচয় পাওয়া যায়। তিনি নিছক অনুধ্যানের মাধ্যমে দার্শনিক সিদ্ধান্তে পৌঁছনোর ব্যাপারে সন্দিহান ছিলেন। সুনির্দিষ্ট ও নির্ভরযোগ্য জ্ঞানের সাহায্যে তাঁর দার্শনিক সিদ্ধান্তসমূহ নিঃসৃত হয়। ক্রিপ্টোলজি ও ক্রিপ্ট্যানালিসিসে তাঁর যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। গুপ্ত সঙ্কেতের মর্ম উদ্ধারের জন্য তিনি নতুন গাণিতিক পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। চিকিৎসাবিদ্যায় তিনি এমন এক স্কেল আবিষ্কার করেছিলেন যার সাহায্যে চিকিৎসকেরা ঔষুধের কার্যকারিতা পরিমাপ করতে সক্ষম হন।

জ্ঞানের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে আল কিন্দি তিনটি বিষয়ের অবতারণা করেন—ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি ও কল্পনা। ইন্দ্রিয়-অভিজ্ঞতায় আমরা যে সমস্ত তথ্য পাই, বুদ্ধি তাকে আকার দেয়, সেখান থেকে জন্মলাভ করে প্রজ্ঞা। আর এই দুয়ের মধ্যে সমন্বয়সাধকের কাজ করে কল্পনা। আল কিন্দির ৯০০ বছর পর জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট আধুনিক যুগে এমন সমন্বয়বাদী জ্ঞানতত্ত্ব প্রচার করে জগৎবিখ্যাত হন।

কার্যকারণ বিষয়ে আল কিন্দি অ্যারিস্টটলকে অনুসরণ করেছেন বহুলাংশে। তাঁর মতে, জগতে কারণ ছাড়া কিছুই ঘটে না। কিন্দি সর্বশক্তিমান আল্লাহ-র অস্তিত্বে বিশ্বাসী ছিলেন। সমস্ত কার্যের একটি মূল কারণ আছে, এই মূল কারণের কোনও কারণ নেই; এই মূল কারণ হলেন আল্লাহ। আল্লাহ জগতের স্রষ্টা, কিন্তু তিনি জগতের কোনও কাজে সরাসরি হস্তক্ষেপ করেন না। কারণ, আল্লাহ মানুষকে স্বাধীন ইচ্ছা প্রদান করেছেন। কিন্দি আত্মা ও জড়কে সম্পূর্ণ পৃথক সত্তা বলেছেন। প্রজ্ঞাজগতকে অনন্ত বলেছেন তিনি এবং মানুষের আত্মা বা বুদ্ধিজগৎকে অনন্তের সঙ্গে সম্পর্কিত বলে আখ্যা দিয়েছেন। আত্মার যে বুদ্ধি তার চারটে ভাগ আছে—সুপ্ত বুদ্ধি, সক্রিয় বুদ্ধি, অর্জিত বুদ্ধি ও চালক বুদ্ধি। বিচার বিশ্লেষণের ক্ষমতা হল সুপ্ত বুদ্ধি, আত্মার প্রকৃত অভ্যাস হল সক্রিয় বুদ্ধি, অর্জিত বুদ্ধি হল জ্ঞানের প্রয়োগে, চালক বুদ্ধি হল চূড়ান্ত এবং জাগতিক সব কিছুর উর্ধ্বে।

আল কিন্দি জানান, পৃথিবীতে যা কিছু অস্তিত্বশীল তাদের সবার মধ্যে নিহিত আছে সত্য। কী সেই সত্য? আল কিন্দি তার জবাব দিয়েছেন নিজেই। সেই সত্য হলেন আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা। 'অন ফার্স ফিলোজফি' আল কিন্দির বিখ্যাত গ্রন্থ। আর সেটি হল ঈশ্বর বিষয়ক। সেখানে তিনি আল্লাহ-র প্রকৃতি বিশ্লেষণ করেছেন।

আল কিন্দি সারা জীবনে দু'শোর বেশি গ্রন্থ রচনা করেন। জ্যামিতির উপর ৩২-টি, চিকিৎসা ও দর্শন নিয়ে ২২-টি, যুক্তিবিজ্ঞানের উপর ৯-টি, পদার্থবিদ্যা নিয়ে ১২-টি এবং বাকি গ্রন্থ অন্যান্য বিষয় নির্ভর; মনোবিজ্ঞান থেকে সঙ্গীততত্ত্ব ইত্যাদি। মুসলিম পেরিপ্যাটেটিক দার্শনিকদের যে ঘরানা, সেই ঘরানার জনক ছিলেন আল কিন্দি। তাঁর দর্শনচিন্তাকে সামনে রেখে পরবর্তীকালে বহু চিন্তাবিদ রচনা করেছেন হাজার হাজার দার্শনিক গ্রন্থ।

আল কিন্দির নৈতিক চেতনা ছিল অত্যন্ত উচ্চমানের। তিনি বৌদ্ধিক আত্মা বা রুহের শরীর অন্যান্য ঈন্দ্রিয়াদি থেকে পৃথক করেন। বৌদ্ধিক আত্মা হল সৎ-আমি। মৃত্যুর পরেও যার বিনাশ হয় না। তবে আল কিন্দি-র নৈতিক প্রবন্ধ সমূহ যা ফিহিরিস্ত নামক সঙ্কলনে ছিল তার বেশির ভাগই হারিয়ে গেছে। অন ডিসপেলিং ম্যাডনেস নামের যে গ্রন্থটি প্রচলিত রয়েছে তার থেকে দার্শনিক তত্ত্বের পাশপাশি তাঁর নৈতিক উপদেশাবলীরও সন্ধান পাওয়া যায়। দুঃখ মানবজীবনের এক অমোঘ অঙ্গ। এই দুঃখকে জয় করার কৌশল আয়ত্ত করেছিলেন আল কিন্দি। এমন ব্যক্তিগত অর্জনকে তিনি উৎসর্গ করেছেন সাধারণের উদ্দেশ্যে। তাঁর গ্রন্থপাঠ করে এ বিষয়ে ঋদ্ধ হই আমরা।

বিশ্বতত্ত্ব নিয়ে আল কিন্দির রচনাসমূহ নক্ষত্র, গ্রহ ও অন্যান্য মহাজাগতিক বিষয়ক সম্যক জ্ঞান প্রদান করে। পদার্থবিদ্যা ও গণিত ছিল তাঁর পছন্দের বিষয়। কোরান ও গ্রিক বিজ্ঞানের সমন্বয়ে তাঁর অধিবিদ্যা গড়ে ওঠে। হেলেনীয় তত্ত্ব সমূহের সঙ্গে শেরনীয় দর্শনের অদ্ভুত সংমিশ্রণ ঘটান আল কিন্দি। পাশাপাশি সৃষ্টিতত্ত্বের প্রধান বিষয়—আল্লাহ ও তাঁর রুহ নিয়ে তিনি বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। আল কিন্দি বলেছেন—'সমস্ত ঐক্যের মাঝে রয়েছেন আল্লাহ। আর এভাবেই আমি পেয়ে যাই অনন্য সেই সত্তাকে, যার কোনো আকার নেই, ওজন নেই, মাত্রা নেই, গোত্র নেই, বর্ণ নেই, প্রজাতিও নেই। সকল ঐক্যের মধ্যে তিনি বিদ্যমান। তিনি ধ্রুব সত্য।' (অন ফাস্ট ফিলজফি, চতুর্থ অধ্যায়)

আল কিন্দি বাগদাদে শিক্ষা লাভ করেন। বাগদাদে তখন অনুবাদের যে ধারা শুরু হয়েছিল তাকে বলা হয় 'ট্রানস্লেশন রেভোলিশন'। প্রথম দিকে তিনি অনুবাদের কাজে সাহায্য করতেন। পরবর্তীকালে নিজেই হয়ে ওঠেন দক্ষ অনুসৃজনকারী। মহান এই দার্শনিক পরিণত বয়সে বাগদাদ শহরে মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর এতদিন পরেও আমাদের মনের আকাশে তাঁর অবস্থান উজ্জ্বল নক্ষত্রের মতো। এ নক্ষত্রের আলো শেষদিন পর্যন্ত মানব-মনীষাকে পথ দেখাবে বলে মনে হয়।

(অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক। shamim.phil@gmail.com)

ইউটোপিয়ান দর্শনের জনক প্লেটো

কামরুজ্জামান

প্লেটো (৪২৭-৩৪৭ খ্রি. পূ.) গ্রিক রাষ্ট্রদর্শনের এক অতি উজ্জ্বল নক্ষত্র। তিনি ভাববাদী বা ইউটোপিয়ান দর্শনের জনক। তাঁর দর্শন বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। তিনি হলেন সক্রেটিসের সুযোগ্য শিষ্য এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জনক অ্যারিস্টটলের শিক্ষক। রাষ্ট্র সম্পর্কিত দর্শন তাঁর হাতেই সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গ এবং স্বার্থক কলেবর প্রাপ্ত হয়।

প্লেটো ছিলেন সেই সব সীমিত সংখ্যক মানুষের একজন, যিনি ঈশ্বরের অকৃপণ করুণা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্ম হয়েছিল সম্ভ্রান্ত ধনী পরিবারে। অপরূপ দেহ লাবণ্য না থাকলেও ছিলেন সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, সুমিষ্ট কণ্ঠস্বর, অসাধারণ বৌদ্ধিকসত্তা সম্পন্ন। জ্ঞানের প্রতি প্রচণ্ড আকর্ষণ ছিল তাঁর। সক্রেটিসের মতো গুরুর শিষ্যত্ব লাভ—সব কিছুতেই তিনি ছিলেন সৌভাগ্যবান।

প্লেটোর প্রাথমিক শিক্ষা তার মা (পেরিকটিওন)-বাবার (এরিস্টন) কাছে। সঙ্গে সঙ্গে চলে সঙ্গীত, নাটক ও কাব্যচর্চা। প্লেটো বিভিন্ন শিক্ষকের কাছে শিক্ষা লাভ করেছেন। কুড়ি বছর বয়সে (৪০৭ খ্রি. পূ.) শিক্ষা গ্রহণের জন্য তাঁকে পাঠানো হয় সক্রেটিসের নিকট। সেখানে এক নাগাড়ে আট বছর চলে বিদ্যাচর্চা। এইসূত্রে তিনি নিবিড় জ্ঞানার্জন করেন আইন, নীতি, শিক্ষাবিজ্ঞান, গণিত, উদ্ভিদবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান এর মতো নানা বিষয়ে। সক্রেটিসের মৃত্যুর পর প্লেটো তিন বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিকের (ফিলোনাস, আরকাইটাস, ইউরাইটাস) কাছে দর্শনশাস্ত্রের নিবিড় পাঠ নেন।

তরুণ প্লেটো অল্পদিনের মধ্যেই হয়ে উঠলেন সক্রেটিসের প্রিয়তম শিষ্য। গুরুর বিপদের দিনেও তিনি ছিলেন তাঁর নিত্যসঙ্গী। প্লেটো শুধুই যে সক্রেটিসের প্রিয়শিষ্য ছিলেন তা নয়, তিনি হলেন গুরুর জ্ঞানের ধারক-বাহক। গুরুর প্রতি তাঁর মতো গভীর শ্রদ্ধা খুব কম শিষ্যের মধ্যে দেখা যায়। প্লেটো যা কিছু লিখেছেন, বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই তার প্রধান নায়ক সক্রেটিস। সক্রেটিসকে কেন্দ্র করে প্লেটো তাঁর সব সংলাপ-তত্ত্বকথা প্রকাশ করেছেন; নিজেকে আড়ালে রেখেছেন যথাসম্ভব। সক্রেটিসের জীবনের অন্তিম পর্যায়ের অসাধারণ বর্ণনা স্থান পেয়েছে 'সক্রেটিসের জীবনের শেষ দিন' গ্রন্থে। বিষয় ও রচনারীতির নিরিখে এ গ্রন্থের তুলনা মেলা ভার।

৩৯৯ খ্রি. পূর্বাব্দ নাগাদ এথেন্স শত্রুপক্ষের হাতে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হলো। এইসময় এথেন্সে থাকা নিরাপদ নয় ভেবে প্লেটো বেরিয়ে পড়লেন দেশভ্রমণে। তিনি যখন যে দেশে যেতেন সেখানকার জ্ঞানী-গুণী পণ্ডিতদের সঙ্গে নানা বিষয়ে আলোচনা করতেন। এতে একদিকে যেমন তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ও জ্ঞানের প্রসার ঘটেছিল; অন্যদিকে তেমনি পণ্ডিত, দার্শনিক হিসেবে তাঁর খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল চারদিকে।

বারো বছর পর (৩৮৭ খ্রি. পূ.) প্লেটো আবার এথেন্সে প্রত্যাবর্তন করেন। অতঃপর শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, শিক্ষণীয় বিষয় এসব নিয়ে কাজ শুরু করলেন। দর্শনের পাশাপাশি তিনি পদার্থবিজ্ঞান, গণিত প্রভৃতি বিষয়কেও শিক্ষাক্রমে অন্তর্ভুক্ত করেন। দর্শনের সঙ্গে পদার্থ ও গণিত বিজ্ঞানের লুকিয়ে থাকা নিবিড় সম্পর্কটি প্লেটোই প্রথম তাঁর অর্জিত জ্ঞানে উপলব্ধি করেন। বেশ কিছু শিক্ষিত মানুষকে একত্র করে এক বিশাল বাগানবাড়ি কিনে তথায় গড়ে তোলেন তাঁর সাধের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বা আকাডেমাস। প্লেটোর আগে গ্রিসে বিভিন্ন জায়গায় উপাস্য দেবতাদের নামে গড়ে উঠেছিল বেশ কিছু আকাডেমাস। তখন এইসব আকাডেমাসে বিদ্যার পরিবর্তে শরীর-শিক্ষা দেওয়া হতো। প্লেটোর আগে দর্শনশাস্ত্রে কোনো শৃঙ্খলা ছিল না। তিনিই প্রথম একে একটি সুদৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠা করলেন। নতুন মাত্রা আরোপ করলেন দর্শনশাস্ত্রের উপর।

সঙ্গীতের প্রতি প্লেটোর ছিল গভীর আকর্ষণ। তিনি বিশ্বাস করতেন সঙ্গীত মানবসভ্যতার বিকাশকে পূর্ণতা দেয়, মানবিক গুণকে বিকশিত করে। তাই তিনি তাঁর কল্পিত আদর্শ রাষ্ট্রের শিক্ষা ব্যবস্থায় সঙ্গীতকে এক বিশেষ স্থান দিয়েছেন। দার্শনিক প্লেটোর প্রতিভার আরেক দিক কবি-সত্তা। তাঁর রচিত প্রবন্ধসমূহের মধ্যে একদিকে যেমন প্রকাশ পেয়েছে জ্ঞানের গভীরতা, প্রজ্ঞা; অন্যদিকে ফুটে উঠেছে অনুপম লালিত্য। দর্শনের ভাষা যে এমন প্রাণবন্ত, কাব্যসৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে, প্লেটোর লেখা না পড়লে তা অনুভব করা যাবে না। উল্লেখ্য, নিজে কবি স্বভাবের হলেও প্লেটো তাঁর কল্পিত রাজ্যে কবিকে স্থান দেননি। কবিদের আবেগপ্রাণতা, ভাবালুতা রাষ্ট্রীয় শৃঙ্খলার পক্ষে প্রতিবন্ধক হবে বলে তাঁর মনে হয়েছিল। নারীদের প্রতি তাঁর ছিল গভীর শ্রদ্ধা; মেয়েদের শিক্ষা সম্পর্কে উদার নীতিতে বিশ্বাসী ছিলেন তিনি। প্লেটো মনে করতেন, পুরুষেরা অহমিকাবশত নারীদের উপেক্ষা করে। তাঁর বিশ্লেষণে প্রতিপন্ন হয়, বিভিন্ন গ্রিক মনীষীর প্রেরণায় উৎস হচ্ছে নারী।

প্লেটো একেশ্বরবাদী। তাঁর ঈশ্বর মঙ্গলময়, মানুষের কল্যাণকামী। তিনি পূজা-পাঠ ও উপাসনাকে স্বীকার করেননি। প্রজ্ঞা, জ্ঞানের মাধ্যমেই ঈশ্বরের পূজা করতে হয়, মনে করতেন তিনি। প্লেটোর লিখিত গ্রন্থের সংখ্যা প্রায় ৩৫টি। যৌবনকালের অন্যতম রচনা—Apology, Crito Lysis, Charmids, Protogoras, Laches. প্রাপ্তবয়স্ক হয়ে রচনা করেন Parmenidis, Phaedo, Republic, Symposium প্রভৃতি। জীবনের শেষ পর্বের রচনাগুলির মধ্যে Stateman, Laws উল্লেখযোগ্য। Republic এ ন্যায়ের প্রকৃতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। Stateman গ্রন্থে আইনের শাসন স্বৈরতন্ত্রের থেকে শ্রেয় বলে বিবেচিত হয়েছে। আবার 'Laws' এ মিশ্র সংবিধানের পক্ষে সওয়াল করেছেন গ্রন্থকার। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের আলোচনায় এসব গ্রন্থ বিশেষভাবে সমাদৃত হয়েছে।

প্লেটোর নির্মিত ভাববাদী দর্শনের উল্লেখযোগ্য তিনটি বৈশিষ্ট্য হল—১। শুধুমাত্র ইন্দ্রিয়ানুভূতির মাধ্যমে জ্ঞান সম্ভব নয়, প্রকৃত জ্ঞান অতীন্দ্রিয় জগতে বিদ্যমান, ২। চিরন্তন ধারণা বা আদর্শ হলো যথার্থ সত্য এবং তা দৃশ্যমান বিষয় থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র, ৩। আপাত বিক্ষিপ্ত সত্যের মূল্যায়ন যথার্থ সত্যের নিরিখে করা উচিত। কেবল যথার্থ সত্যের আলোকেই চিরন্তন আদর্শ গড়ে ওঠে। তাঁর এই সিদ্ধান্তের সমীপে আজও প্রণত হন প্রাজ্ঞজনরা।

প্লেটোর কৃতির মূল্যায়ন করা হয়েছে এভাবে—'প্লেটো শুধু ভাবুক ছিলেন না, ছিলেন কলাকুশলী, তাঁর প্রতিটি রচনাই সাহিত্যিক নিপুণতার এক উৎকৃষ্ট নিদর্শন, কোথাও তাঁর রচনা নাটকীয়, কোথাও ঐতিহাসিক ঘনঘটায় আচ্ছন্ন, ভোরের আলোছায়ার মতো তার রচনায় হাস্যরস, গাম্ভীর্য, করুণ রস একই সাথে পরস্পরকে অনুগমন করেছে। বিষয়-বৈচিত্র্যে, রচনাশৈলীর সৌন্দর্য আর বিশুদ্ধতায় প্লেটোর নাম পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সাহিত্য স্রষ্টাদের পাশে অমর হয়ে থাকবে।' (রাসেল)

রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও দার্শনিক হিসেবে প্লেটোর কৃতিত্ব এখানেই, যে আড়াই হাজার বছর আগে জন্মগ্রহণ করেও তিনি ভাবনার স্বাকীয়তায় আজও সমানভাবে সমাদৃত ও প্রাসঙ্গিক। তাঁর লেখা ও আদর্শ প্রভাবিত করে চলেছে পাশ্চাত্য সমাজ সহ গোটা দুনিয়াকে। .

(গ্রন্থকার-প্রাবন্ধিক। skkamruzzaman5@gmail.com)

পত্রিকা-বীক্ষণ

প্রসঙ্গ 'শিখা' : প্রীতিতির আঙিনায় যা প্রতীয়মান হয়

অদ্যাবধি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত সংবাদ-সাময়িকপত্রের সংখ্যা দশ সহস্রের অধিক। এই বিপুল সংখ্যক পত্র-পত্রিকার সবগুলি অবশ্যই সমান গুরুত্বপূর্ণ নয়। তবে কোনো কোনোটির কথা আলাদা করে স্মরণ করতেই হয়। মুসলিম সাহিত্য সমাজ-এর মুখপত্র শিখা যেমন।

১৯২৬ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন মুসলিম যুবক মুসলিম সাহিত্য সমাজ নামের একটি সংগঠনের জন্ম দেন, মুসলমান সমাজে মুক্ত চিন্তার চাষ করা-র লক্ষ্যে। বৎসরান্তে এই সংগঠনের মুখপত্র রূপে প্রকাশিত হয় শিখা। অতঃপর শিখা-র শিখায় আলোকিত ও চমকিত হন গোটা বাঙালি সমাজ। আক্ষরিক অর্থেই এখানে মুক্তবুদ্ধির চাষ করা হয়। পত্রিকার শীর্ষদেশে মুদ্রিত হয় এই অমিয় বাণী-'জ্ঞান যেখানে সীমাবদ্ধ, বুদ্ধি সেখানে আড়ষ্ট, মুক্তি সেখানে অসম্ভব।'

যে প্রেক্ষিতে মুসলিম সাহিত্য সমাজ বা শিখা উৎসারিত হয়েছিল প্রসঙ্গত তার অনুধ্যান জরুরি। এমনিতে বাংলায় নবচেতনার প্রভাব ছড়িয়ে পড়তে শুরু করেছিল উনিশ শতকের দুই এর দশকেই। কিন্তু নানা কারণে নবচেতনার প্রভাবে সেভাবে আলোড়িত হতে পারছিল না এখানকার মুসলমান সমাজ। পলাশির যুদ্ধের অভিঘাতে তখনো আচ্ছন্ন হয়ে ছিল তারা। এই আচ্ছন্ন ভাবের অবসান হতে হতে অতিক্রান্ত হয় আরও অর্ধ শত বছর। বলা যায়, সাত-আটের দশকে এসে বাংলার মুসলিম সমাজ নবচেতনার আলোয় একটু একটু করে স্নাত হতে শুরু করে। বিশ শতকে পৌঁছে তা অন্য মাত্রা পায়; আর তখনই সূত্রপাত হয় এক সামাজিক সংকটের। এই সংকট প্রস্তুত করে মুসলিম সাহিত্য সমাজ বা শিখা-র পটভূমি।

ততদিনে মুসলিম সমাজে একটা শ্রেণির জাগরণ ঘটেছে যারা প্রথাবদ্ধতার বাইরে বেরিয়ে এসে তাদের সময় ও পারিপার্শ্বিকতাকে একটু অন্যরকম করে বিচার করে দেখতে চায়। তাদের এই চাওয়া না পছন্দ হয় অনেকেরই। এতে সংঘাত তৈরি হয় এবং তার ফলে রক্তাক্ত হয় সমাজ-মন। মাত্র পাঁচ বছরেই থেমে যায় মুসলিম সাহিত্য সমাজের পথ চলা। প্রবল সামাজিক চাপের কাছে নতি স্বীকার করে রণাঙ্গন ত্যাগ করতে হয় শিখা-র কুশীলবদের। বলা যায়, এক প্রবল সম্ভাবনার পরিসমাপ্তি হয় অবিশ্বাস্য রকমের দ্রুত গতিতে এবং অবশ্যই নেতিবাচক পথে।

শিখা-র শিখা নির্বাপিত হয়েছে তাও শত বছর হতে চললো। একটা পত্রিকাকে সময়ের স্রোতে ভাসিয়ে দিয়ে নিছক ইতিহাসের সামগ্রীতে পরিণত করার জন্য সময়টা মোটেই কম নয়। কিন্তু তারপরেও শিখা ইতিহাসের পাতায় মুদ্রিত সত্য মাত্র নয়, একান্ত জীবন্ত বিষয়। আজও আমরা আমাদের যাপিতজীবনে শিখা-কে ধারণ ও বহন করছি প্রবল ভাবে, প্রাণিত হতে চাইছি এর দ্বারা। একদিকে আমাদের এই চাওয়া, অন্যদিকে মাত্র পাঁচ বছরে শিখা-র পথ চলা বন্ধ হওয়া, দুই এর মধ্যে যে বৈপরীত্য রয়েছে তা আমাদের পীড়িত করে। প্রশ্ন হলো, কেন এই পীড়িত হওয়া? এমন পীড়িত হওয়ার দায় কার অথবা কাদের কতটা?

শিখা-কে মাঝখানে রাখলে এর দুই দিকে যে দুটি পক্ষকে দাঁড় করানো চলে তা হলো, শিখা-র লেখক গোষ্ঠী ও সমকালীন সামাজিক নেতৃবৃন্দ। এক্ষেত্রে দ্বিতীয় পক্ষ অর্থাৎ সামাজিক নেতৃবৃন্দ শিখা-র নেতিবাচক পরিণতির দায় কোনোভাবেই অস্বীকার করতে পারেন না। তবে এই দায় শুধুই তাঁদের উপর বর্তায় কি না তা নিয়ে কথা থেকে যায়।

শিখা-র কুশীলবরা যা করার লক্ষ্যে পথে নেমেছিলেন তা শুধু সেদিনের সাপেক্ষ নয়, আজকের নিরিখেও বিস্ময়কর। বলা যায়, সেদিন তাঁরা যদি লক্ষ্যে উপনীত হতে পারতেন তবে আজ হয়তো মুসলিম সমাজের সামাজিক ইতিহাস অন্যভাবে লেখা হতো। চিন্তার যে বন্ধ্যাত্ব মুসলমান সমাজকে গ্রাস করেছে তার থেকে বেরিয়ে আসার পথ খুঁজে পাওয়া যেত অনেকদিন আগেই। এটা না হওয়া দুর্ভাগ্যের। কিন্তু এর থেকে অন্যরকম কিছু হওয়াও যে খুব স্বাভাবিক ছিল, তা জোর দিয়ে বলা যাবে না।

যে কোনো বিষয়ই পরিবেশ, পরিস্থিতি সাপেক্ষ সত্য; শিখা-রূপ মহতী উদ্যোগও অবশ্যই তার ব্যতিক্রম হয়। তাই যদি হয় তবে প্রশ্ন থেকে যায়, শিখা-র চালকরা তাঁদের সময়কে কতটা মান্যতা দিয়েছিলেন; সময়ের চাওয়া পাওয়া অনুসারে নিজেদেরকে ভেঙে ভেঙে নতুন করে নির্মাণ করার বিষয়ে আগ্রহী ছিলেন কি না? আমাদের মনে হয়, এক্ষেত্রে তাঁদের দিক থেকে কমবেশি সমস্যা ছিল। তখনও পর্যন্ত মুসলমান সমাজ অগ্রগতির লক্ষ্যে যতটা পথ হাঁটতে পেরেছিল তা আহামরি কিছু ছিল না। মধ্যবিত্ত সমাজের মননচর্চার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হচ্ছিল মাত্র। এমন অবস্থায় সামাজিক ক্ষেত্রে নতুন কোনো ভাবনাকে চাউর করার চেষ্টা করা হলে দুই পা পিছিয়ে তবে একপদ অগ্রসর হতে হয়। তা না হলে যে বিশৃঙ্খলা তৈরি হয় তাতে ঝলসে যায় সবকিছু। খুব সম্ভব মুসলিম সাহিত্য সমাজ এর ব্যাকরণে প্রয়োজনে এই পিছিয়ে আসার বিষয়টি নথিভুক্ত ছিল না। সমাজের সদস্যরা কেবল একমুখীনভাবে সামনের দিকে অগ্রসর হওয়ার চেষ্টা করেন এবং যেখানে বাধা পান সেখানেই থেমে যান। বিকল্প কোনো পথে পা রাখার চেষ্টা তাঁরা করেননি। ফলত সমস্যা হয়েছে। শিখা-র সূত্রে বিশেষ কোনো সামাজিক সত্যের প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। সমাজ-মনকে কমবেশি ঝাঁকুনি দিয়েছে মাত্র।

আর্থিক সমস্যা থেকে শুরু করে অন্য অনেক প্রতিবন্ধকতা ছিল। তবু তারপরেও শিখা-র প্রজ্জ্বলিত থাকা মোটেই অস্বাভাবিক ছিল না, যদি এর লেখকগোষ্ঠী তীব্র সামাজিক বিতর্কে না জড়িয়ে পড়তেন। ইসলাম ধর্ম ও মুসলমান সমাজ কেন্দ্রিক যে সব প্রশ্নকে সেদিন সামনে আনার চেষ্টা করা হয়েছিল তার গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ না থাকা স্বাভাবিক। প্রত্যেকটি প্রশ্নই যৌক্তিক এবং সময়-উপযোগী ছিল। তবে সমস্যা হয়েছিল এর রূপায়ণে। সমাজ এমন একটা সত্য, যাকে বাইরে থেকে আঘাত করে সাধারণত টলানো যায় না। সমাজের সঙ্গে মিশে গিয়ে একে ভিতর থেকে একটু একটু করে পরিবর্তন করতে হয়। মুসলমান সমাজের ক্ষেত্রে একথা আরও বেশি করে সত্য। গভীর ধর্মীয় মূল্যবোধের উপর প্রতিষ্ঠিত এই সমাজ বাইরের যে কোনো আঘাতকে হেলায় প্রতিহত করতে পারে। মুসলমান সমাজের দেহে কোনোরকম অস্ত্রোপচার করতে হলে ধর্মীয় মূল্যবোধের সাপেক্ষেই তা করতে হয়। মনে হয় এখানেই হয়েছিল মূল সমস্যা।

শিখা-র কুশীলবরা তত্ত্বগতভাবে ইসলামকে ধারণ ও বহন করতেন নিষ্ঠার সঙ্গে। কিন্তু তাঁদের ব্যবহারিক জীবনে ইসলামের প্রভাব কখনো তেমন প্রকট হয়ে ওঠেনি। এতে সাধারণ মুসলমানসমাজের সঙ্গে তাঁদের আত্মিক যোগ তৈরি হয়নি। এই অবস্থায় তাঁরা যখন সংস্কারের সম্মার্জনী হাতে পথে নেমেছিলেন তখন সঙ্গত কারণে তীব্র প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়েছিল।

যতদূর মনে হয়, ওপার বাংলার অবস্থা কমবেশি অন্যরকম হলেও এমন প্রতিক্রিয়াশীলতার জায়গা থেকে এপার বাংলার মুসলমান সমাজ আজও সেভাবে বেরিয়ে আসতে পারেনি। তাই যদি এই সমাজের জন্য কিছু করতে হয়, তবে শিখা-র ভাবাদর্শে স্নাত হয়ে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য পত্রিকা, মোহাম্মদী, সওগাত প্রভৃতিকে আপাতত অনুসরণ করা শ্রেয়।

সম্পাদক (৮৬৩৭০৮৬৪৬৯)

আলিয়া সংস্কৃতি সংসদ-এর পক্ষে সাইফুল্লা-র সম্পাদনায় মীর রেজাউল করিম কর্তৃক
৩৮, ডা. সুরেশ সরকার রোড, পশ্চিম ব্লক (দ্বিতীয় তল), কলকাতা-৭০০০১৪ থেকে প্রকাশিত।